প্রিয় শহরকে নতুন করে জানা

যুগশঙ্খ SUPPLI

কলকাতা

সোমবার, ১ মে ২০১৭

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

সব শিল্পীই তাঁর সৃষ্ট শিল্পের কদর পেতে চান। কলকাতাও কদর করতে জানে শিল্পীদের, গুণী মানুষদের। সেটা দেখি আমরা প্রতিনিয়তই টিভিতে, কাগজে বা চাক্ষুষ। তাঁরাও জানেন, কলকাতার সংগীতপ্রেমের কথা। তাই হয়তো আশায় বুক বেঁধে সুদূর গ্রাম থেকে চলে আসেন কলকাতায় নিজের শিল্পের নমুনা দেখিয়ে কলকাতার মানুষজনের কাছ থেকে কদর পেতে। স্যরি, কদর নয়, উপার্জনের আশায়। কারণ তাঁদের কাছে সুদৃশ্য মেডেলের থেকে পেটের খিদে মেটানোর জন্য দুটো টাকা অনেক বেশি মূল্যবান। প্রতিদিনের মতো আজও তাই...

ফোটো: **প্রলয় হাজরা** | লেখা: **শর্মিলা চন্দ্র**

আমার চোখে কলকাতা

হরনাথ চক্রবর্তী (চিত্র পরিচালক)

আমার কাছে কলকাতা এক কথায় সুন্দর। চিরন্তন। ছোটবেলায় কলকাতার একরকম সৌন্দর্য উপলব্ধি করতাম, আর এখন অন্যরকম উপলব্ধি করি। আগের থেকে কলকাতা অনেক বদলেছে। অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে। চারিদিকে গাছপালা, সুন্দর সুন্দর আলোতে সেজে উঠেছে তিলোত্তমা। সন্ধেবেলা রাস্তায় বেরোলে তো একেবারে অন্যরকম লাগে। কলকাতায় আছি নাকি অন্য কোনও শহরে, বুঝতে পারি না। রাস্তাঘাটও আগের থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিছন্ন হয়েছে। রাস্তা দিয়ে গেলে আজকাল আর জঞ্জালের গন্ধ পাওয়া যায় না। একটা সময় নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটতে হতো।

তবে খারাপ লাগে ফুটপাথ দিয়ে এখন হাঁটা প্রায় দায় হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ফুটপাতগুলো বড্ড বেশি দখল হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথ তো মানুষের হাঁটার জন্যই, সেখান দিয়ে আজ আর মানুষ হাঁটতে পারে না, বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়। এই সমস্যার সমাধান হলে ভালো লাগবে। এর সঙ্গে কলকাতার ট্রাফিকের তো একটা সমস্যা রয়েছেই।

তবে কলকাতার যতই সমস্যা থাক না কেন, পুরনো কলকাতার মাদকতা, আজও উপলব্ধি করি। এছাড়া কলকাতার শিল্প-সংস্কৃতির তো একটা ব্যাপার রয়েছে। যেটা আমাকে ভীষণভাবে টানে। গানবাজনা, সাহিত্য সবকিছুর মেলবন্ধন রয়েছে এখানে। তাই কলকাতা অন্য শহরের চেয়ে অনেক আলাদা। এখানকার মানুষের মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগ আছে, সেটাও আমার খুব ভালো লাগে। যাই হোক না কেন, একে অন্যকে নিয়ে অন্তত ভাবে। এই শহর আমায় অনেক কিছু দিয়েছে। যেটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া।

কলকাতায় কত কিছু দেখবার জায়গা রয়েছে। ঘোরার জায়গা রয়েছে. এখানে গঙ্গার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি আমরা। তবে দিন দিন গঙ্গাদূষণ যেভাবে বেড়ে চলেছে, তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গাদূষণ পুরাপুরিভাবে বন্ধ হলে ভালো লাগবে। শেষে একটাই কথা বলব, কলকাতা আরও বেশি সুন্দর হোক, শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকে আরও বেশি করে এগিয়ে যাক— এই কামনাই করি।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

ছোট্ট হেল্প

সোমনাথ আদক

রোজকার দশটা-পাঁচটার যাতায়াতের পথে কত ঘটনাই না ঘটে। পরিচয় হয় নতুন মানুষজনের সাথে, কখনও আড্ডায় জমজমাট হয়ে ওঠে সদ্য পরিচিত বন্ধুমহল। কখন যেন সহযাত্রী বিনুদা হয়ে যায় রক্তের সম্পর্কের বড়দার মতো। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, বাজারদর থেকে মোবাইলের ডেটাপ্যাকের আলোচনায় যখন সরগরম হয়ে ওঠে চারপাশের পরিবেশ, তার ভেতরেই কোথাও যেন লুকিয়ে থাকে সারাদিনের ক্লান্তি কাটানোর উপকরণ। রোজই একই টাইম, একই বাস, একসাথে যাওয়া; তবুও এই যাওয়া-আসার পথে কিছু কিছু ঘটনা থাকে যেগুলো হৃদয়ের কোমল কুঠুরিতে জায়গা করে নেয়।

দুপুরের চড়া রোদ সবেমাত্র খোলস ছেড়ে বেরোচ্ছে। ঘুম থেকে দেরিতে ওঠায় অফিস পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লেট হবে বুঝতেই পারছিলাম। চারিদিকে একটা কেমন যেন খাঁ খাঁ ঝিমধরা পরিবেশ। সোদপুরে বাসে ওঠার পর থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে আজকের দাবদাহ অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি হতে চলেছে। জানালার পাশের সিটটাতে বসে পেন্ডিং কাজের হিসাব কষছি একমনে। হঠাৎ ডানলপে কাজলদার এন্ট্রি হল, 'কী ভায়া আজ আবার লেট! আমিও।' আমিও তার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বললাম, 'কী আর করি বলো? সেম প্রবলেম। লেট রাইজার। আসলে রবিবারের আমেজটা কিছুতেই কাটতে চায় না।' কাজলদাও আমার মতোই লেট রাইজার। তাই যথারীতি গতকালের ছুটির আমেজে বেমালুম হয়তো ভুলেই গেছিল আজ সোমবার। অন্যদিন অনেক লোকজন থাকে যারা একসাথে যাই। আজ শুধু কাজলদা আর আমি। তবুও বিভিন্ন ব্যাপারে গল্প এমনি জমে উঠেছে যে কখন টালা ব্রিজ ক্রস করে বাস শ্যামবাজার বাটার সামনে পৌঁছে গেল বুঝতেই পারলাম না। কাজলদাকে 'বাই' বলে বাস থেকে নামলাম।

কী মনে হল সামনে এক জায়গায় জটলা দেখে সেদিকে

একটু এগিয়ে গেলাম। বেশ কয়েকটা স্কুলড্রেস পরা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আর কয়েকজন অভিভাবক দাঁড়িয়ে। সবার চোখে-মুখেই কেমন একটা অস্থিরতা। মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক, কোনও একজনের অভিভাবক বলেই মনে হল, বেশ অস্থির এবং উত্তেজিত হয়ে বারবার বলে যাচ্ছেন, 'এখানেই তো ছিল, গেল কোথায়? এভাবে তো না বলে ও কোথাও যায় না!' ততক্ষণে আরও অনেক মানুষ এগিয়ে এসেছে ভিড় লক্ষ করে। সবার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ।

হঠাৎ একটা বাচ্চার আঙুল নির্দেশে আমরা সবাই সেদিকে তাকাতে যা দেখলাম, মনে হচ্ছিল আমরা এতজন মানুষ দাঁড়িয়ে, তবুও সবাই যেন কী এক অপার শূন্যতায় ডুবে গেছি। এক বৃদ্ধাকে হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছে স্কুলড্রেস পরা ওই ছোট্ট ছেলেটা...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১ মে ২০১৭

ভুল বসন্ত

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

নকশাল আন্দোলনকে কোনওদিন আমি সামান্যতম সমর্থন করিনি। নকশাল চিন্তা বা দর্শনে একেবারেই আস্থা জন্মায়নি আমার। এদিকে কলকাতায় সেই উনিশশো ষাট সালের শেষে আমার স্কুলের বন্ধুরা, পাড়ার দাদা-দিদিরা হু হু করে চলে যাচ্ছিল নকশালে। আমাদের উত্তর কলকাতার পাড়ায় যে দাদার কাছে অঙ্ক শিখতে যেতাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই ছাত্র, পড়াশোনায় ভালো বলে যার নাম করত সারা পাড়া, সেই ছেলেটা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল একদিন। সেই ছেলেটি একদিন আমাকে বলল, 'তুই কি আমাদের কাজকর্ম নিয়ে কিছু জানিস?' বাড়িতে চাপা একটা গুঞ্জন শুনছিলাম বটে যে অমূল্যদা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ও মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি থাকে না। অ্যাকশনে বেরোয়। পুলিশ ধরতে পারে ওকে। কারণ ওদের অ্যাকশন মানে মানুষ মারা। সেইসব মানুষকে মেরে ফেলা; ওদের মতে যারা সমাজ থেকে শুধু শোষণ করছে। তখন আমার স্কুলের শেষ ধাপ। কয়েক মাস বাকি স্কুলের গন্ডি পেরোবার। আমি সদ্য পড়ছি কার্ল মার্কস, ভ্লাদিমির লেনিন, এদিকে পড়ছি সাভারকার, পড়ছি গান্ধীজির 'The Story of My Experiments with Truth.' রবীন্দ্রনাথকেও নতুন করে আবিষ্কার করছি। বাইরে কলকাতার বাতাসে বইছে নকশাল আন্দোলনের উত্তপ্ত হাওয়া। রাতের শহরে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। সন্ধেবেলায় বেল, জুঁই, মাধবীলতার সঙ্গে বাতাসে ভাসে বারুদের সুপ্ত ঘ্রাণ।

রাতে পাড়ার কুকুরগুলো হঠাৎ খুব জোরে ডেকে ওঠে। কয়েকটি বাড়ি থেকে জানালার খড়খড়ি সরিয়ে টুক করে উঁকি মারে কয়েকজন। তারা দেখতে পায় দু-তিনজন ছেলে কাঁধে ঝোলা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল গলি দিয়ে।

ওরা তার মানে পাড়ায় কারুর বাড়িতে লুকিয়েছিল। কুকুরগুলো চেঁচায় তারস্বরে। মাঝরাতের জানালাগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন বাবা বললেন, অমূল্যদার কাছে আমার আর অঙ্ক করে কাজ নেই। বাবা যোগ করলেন, 'কোনও বড় কমরেড লুকিয়েছিলেন ওঁদের বাড়িতে। পুলিশ ওকে ছাড়বে না। ওর বাড়িতে পড়তে গিয়ে বিপদ বাধাবার কোনও দরকার নেই।'

এদিকে আমার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে মাত্র দু-আড়াই মাস পরে এবং অঙ্ক নিয়ে আমার অবস্থা পুরোপুরি জেরবার। সিলেবাসের অর্ধেক বিষয় মাথায় ঢোকে না। অঙ্কটা কেউ দেখিয়ে না দিলে বিপদে পড়ব যে! বাড়িতে কোনও অঙ্কের লোকও নেই, বাড়ির কেউ-ই অঙ্কের ছাত্র নন। তাছাড়া বাবার নিষেধ মন থেকে মানতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল কেউ কী দল করেন সেজন্য কেন তার বাড়ি যাওয়া যাবে না! আমার ভেতরে বাবার নিষেধের প্রতি একটা প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের কৈশোর-যৌবনে বাবা-মায়ের মুখে মুখে তর্ক করবার পরিসর ছিল না বললেই চলে। ফলে বাবার কথা শুনে মুখ ভার করে দাঁড়িয়েছিলাম এবং অতি বেয়াড়া, অবাধ্য মেয়ের মতো ফের গিয়েছিলাম অমূল্যদার বাড়ি। অমূল্যদার বোন সুপ্রিয়া আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। আমার আর সুপ্রিয়ার কত ভাব। ওদের বাড়ি আর কোনওদিন যাব না তাও হতে পারে? বাড়ির কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে একদিন স্কুল থেকে ফেরবার পথে গেলাম ওদের বাড়িতে। সুপ্রিয়া সেদিন স্কুলে আসেনি, ওদের বাড়ি গিয়ে শুনলাম সুপ্রিয়াকে নাকি ভবানীপুরে তার এক মাসির বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। অমূল্যদা নিজেই বলল। আমি অবাক। 'কেন হঠাৎ মাসির বাড়ি চলে গেল?'

অমূল্যদা সিগারেটে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার জন্যে যখন-তখন বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে। তাই বাবা-কাকারা ভয় পেয়ে বোনকে বাড়িতে রাখতে চাইল না। শেষে আমাকে খুঁজতে এসে যদি ওকে নিয়ে টানাটানি হয় সেইরকম ভয় রয়েছে।'

আমি বললাম, 'তুমি এসব ছেড়ে দাও না কেন অমূল্যদা?' তখনই আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে অমূল্যদা জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি আমাদের কাজকর্ম নিয়ে কিছু জানিস?'

আমি বললাম, 'একটু-আধটু। খুব বেশি কিছু জানি না।'

অমূল্যদা সিগারেট নেভালেন।

'জানতে চাস? আমাদের নিয়ে আগ্রহ আছে তোর?'

আমি বললাম, 'নতুন জিনিস জানতে কে না চায়? হ্যাঁ, আমার আগ্রহ আছে তোমাদের নিয়ে।'

অমূল্যদা বললেন 'বেশ, তাহলে তুই আজ আর একটু বোস, আর একজন কমরেড আজ একটু পরেই আসবে। ও এলে তিনজনে মিলে অনেককিছু বোঝার চেষ্টা করা যাবে।'

আমার তো এদিকে বাড়ি ঢুকতে দেরি করা চলবে না। আমি ঘড়ি দেখলাম।

যে-ছেলেটি অমূল্যদার ঘরে ঢুকল তার এক মুখ দাড়ি। চোখে মোটা চশমা। একেবারে টিপিক্যাল বাম বিপ্লবীর মতন বেশভূষণ। কাঁধের ঝোলাটা খুলে সে বার করছিল লাল কালিতে লেখা কিছু পোস্টার। আমি ঝুঁকে পড়ে পড়লাম একটা পোস্টারের ওপর। তাতে লেখা— 'মরণের মুখে থুতু ছুঁড়ে দিয়ে বাঁচবার নাম/সশস্ত্র সংগ্রাম।'

অমূল্যদা পড়লেন জোরে লাইনটা। তারপর আমাকে বললেন, 'কেমন লাগছে পোস্টারগুলো?'

আমি তখন পাগলের মতো কবিতা পড়ি। কবিতা নিয়ে বলা আমার কাছে তখন কঠিন কাজ ছিল না। বললাম, 'ছড়া হিসেবে লেখাটায় চমক আছে তবে দু-তিনদিন আগে রবীন্দ্রনাথের একটা লেখায় পড়ছিলাম যে মরণকে কখনও অসম্মান করতে নেই। মৃত্যুকে যে যত ঘৃণা করবে সে জীবনকে ততই ভয় পাবে। তাই মরণের মুখে থুতু ছুঁড়ে দিয়ে বাঁচবার মূল্যবোধটা মানতে পারলাম না।'

আমার দিকে রক্তচক্ষে তাকাল অমূল্যদার বন্ধু সুশান্ত। 'শোনো মেয়ে, অল্প বিদ্যে নিয়ে ফুট কেটো না। এটা তোমার বুর্জোয়া বাড়ির ঠাকুরদালান নয় যে পার পেয়ে যাবে। এ মরণ সে মরণ নয়, বুঝলে। প্রতিদিন হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক উপজাতি যেভাবে শোষিত হচ্ছে, মরছে সেটাকেই আমরা মরণ বলি। বুঝেছ?'

আমি বললাম, 'তাহলে শোষণের মুখে থুতু ছুঁড়ে দিয়ে বাঁচবার নাম... এভাবে লিখলেই পারতেন।'

সুশান্ত ফুঁসে উঠল। 'আমাদের কাছে মরণ মানেই শোষণ। মৃত্যু নিয়ে আমাদের কমরেডরা রবীন্দ্রনাথের মতো ন্যাকামি করে লেখে না এটা মাথায় রেখো।'

এবার আমার ফুঁসে ওঠবার সময়, 'রবীন্দ্রনাথ ন্যাকামি করে লিখতেন? ছিঃ। ঠাকুমা ঠিকই বলেন তোমরা বিগড়ে যাওয়া ছেলেপিলে। দুনিয়ার কোনও ভালো তোমাদের দিয়ে হবে না।'

'কী বললে?' সুশান্ত চাপা গর্জন করে।

অমূল্যদা সুশান্তকে হাত তুলে বলেন। 'লেট দ্য ম্যাটার স্টপ।' বলে চোখের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেন। তারপর বলেন 'কুকুরের ওষুধটা এনেছিস তো? রাতে বড্ড জ্বালাচ্ছে। কাল আর একটু হলে কাকাবাবু ধরা পড়ে যেত। পুলিশ ছুটে আসে এত জোরে জোরে ডাকে।'

ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঝোলা থেকে দুটো বড় বড় শিশি বের করে অমূল্যদার টেবিলে রাখল সুশান্ত। শিশির গায়ে মানুষের মাথার খুলির ছবি।

'কী এগুলো?' আমি উদ্বিগ্ন কারণ পাড়ার সব কুকুর-বিড়ালের ওপরেই আমার অগাধ বাৎসল্য। সুশান্ত বলল, 'বিষ। কুকুরগুলো মিশনে বাধা দিচ্ছে।'

আমি দিশেহারা।

'অমূল্যদা তুমি না পাড়ার মস্তানরা কুকুর বিড়ালকে মারলে প্রতিবাদ করতে? কত ছোট থেকে দেখছি দুর্বলের পাশে তোমাকে দাঁড়াতে। এখন সেই তুমি অবলা জীবগুলোকে বিষ দেবে?'

অমূল্যদা অর্ধেক খেয়ে নেভানো সিগারেটখানা ফের ধরালেন।

'এখন ওসব ভাবলে আমাদের চলবে না। আমাদের কাজের লক্ষ্য সফল করতে যা করতে হবে এখন আমরা সেটাই করব। যাইহোক তুই এখন বাড়ি যা। আমাদের এখন অনেক কথা আছে যা বাইরের লোকের সামনে বলা যাবে না। তাছাড়া তোর বাড়িতেও চিন্তা করবে।'

সেদিন অমূল্যদার ঘর থেকে সোজা বাড়ি চলে এসে আর কোনওদিন ও বাড়ি যাইনি। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে পিকিং কথা বলে উঠছে তখন। চিনের রাজধানী পিকিং থেকে তো অনেক আগেই ভারতের নকশাল আন্দোলনকে 'ভারতে বসন্তের জাগরণ' বলে হাততালি দেওয়া হচ্ছিল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক অফিসার সে-সময় আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি বলতেন শিলিগুড়ি বর্ডার ধরে চিন টাকা পাঠাচ্ছে। এদেশের ছোট ছোট ছেলেদের নকশাল মুভমেন্টে টেনে আনা চিনের লক্ষ্য। কিন্তু সে চিন যতই টাকা পাঠাক নকশাল আন্দোলনের আসল মূলধন ছিল আমাদের নিজেদের দেশেরই দারিদ্র, অসাম্য, বঞ্চনা। যদি আমাদের দেশে দারিদ্র্য-দুর্নীতি না থাকত তাহলে কোনও শক্তি এখানে নকশাল, মাওবাদের চাষ করাতে পারত না।

এরপর পরের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১ মে ২০১৭

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা *(দু'য়ের পাতার পর)*

কথায় বলে না যে দারিদ্র্য না থাকলে বিপ্লব না খেয়ে মরবে... শহর জুড়ে শুরু হল মার। নকশালরা মারল। নকশালদেরও মারা হতে লাগল ধরে ধরে। পাড়ার চেনা ছেলেরা পাইপগান নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গলির মোড়ে মোড়ে। তারা দু-একবার সেই পাইপগান থেকে গুলি ছুঁড়ল। তারপর তাদের তরোয়াল নিয়ে তাড়া করল মস্তান বাহিনী। সেই বাহিনী চোখের সামনে টুকরো করে কেটে ফেলল একটা সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলেকে। ছেলেটার মা দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বিস্রস্ত বসনে। ওরে খোকনরে... পাড়া ফেটে পড়ল আর্তনাদে।

বৃদ্ধ মাস্টারমশাই স্কুল থেকে ফেয়ারওয়েল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। হাতে যত্নে ধরা মিষ্টির বাক্স। তাঁকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে তাঁর পেটে বুকে ছুরির ওপর ছুরি চালাচ্ছে নকশালরা। মিষ্টির বাক্স থেকে মিষ্টি ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তাময়। রিকশাওয়ালা ছুটে গিয়ে লুকোচ্ছেন পাঁচিলের আড়ালে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথার দাম ঘোষণা করছেন নকশাল হাই কমান্ড। তিনি সরকরের কাছ থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নিয়েছেন, ফলে তিনি তখন কমরেডদের চোখে দালাল।

প্রায় গোটা কলকতা শহরটাকে ভয় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেউ সকালে বেরোলে সে আবার বাড়ি ফিরবে কিনা সেই ভয় পাচ্ছে বাড়ির লোক।

নকশাল দমাতে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলো গুণ্ডা-মস্তান পুষছে তখন ব্যাপকহারে। সেই মস্তানরা মেয়ের দিকে তাকালে মেয়ের বাবা-মা ভয় পাচ্ছে।

মেধাবী ছেলেমেয়েকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠাতে ভয় পাচ্ছে পরিবার।

পাড়ায় পুলিশ দেখলে শিউরে উঠছে শহর। কোন ছেলেটাকে এবার পুলিশ নিয়ে যাবে ভেবে ঘুমহীন শহরের কত শত ঘর।

বাড়িতে জোরে কেউ কথা বললে ভয় পেয়ে যাচ্ছে শহর। হঠাৎ হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে গেলে শহর চমকে উঠছে।

লালবাজারের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে যাচ্ছে কলকাতা।

নকশাল ছুরি চালাচ্ছে, তো পুলিশও টাঙিয়ে পেটাচ্ছে।

আবার কোনও কোনও কমরেড বলছে যে পুলিশ অফিসার মারে সেও ঠিক আছে কিন্তু যে পুলিশ অফিসার তর্ক করে নকশালদের 'মগজ ধোলাই' করতে চায় সেই তার্কিক আর রাষ্ট্রের তাঁবেদারি করা পুলিশকে আগে খতম করতে হবে।

সুনীল আর সমর সেনের ঝগড়া লাগছে শহরের অভিজাত পার্টিতে। সেখানে সমর সেন নাকি সুনীলকে সত্যজিতের চামচা বলে ডেকে বলছেন যে, সত্যজিৎ রয়েছেন তাঁদের কমরেডদের হিটলিস্টে।

শহর যেন তখন উন্মাদ।

এ ওকে মারছে। সে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

চলন্ত বাসে আগুন দেওয়া হচ্ছে হামেশা।

আমাদের পাড়ায় যখন-তখন শুরু হয়ে যায়

মারপিট।

অমূল্যদা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

একদিন শুনলাম অমূল্যদাকে পুলিশ ধরেছে।

একমাস পরে অমূল্যদার লাশ ফিরল পাড়ায়। সারা শরীরে ব্যান্ডেজ। পোস্টমর্টেমের জন্যে মাথা ঢাকা। মুখটা বেঁকে গিয়েছে একদিকে।

আমি ভাবছিলাম অমূল্যদা বলত ওদের লক্ষ্য পূরণের জন্যে ওরা সব করতে পারে। লক্ষ্য পূরণের পথে কোনও মানবিক নীতি থাকতে নেই, অভাগা নেড়ি কুকুরকে মেরে ফেলব দরকার হলে, দরকারে বিমান হাইজ্যাক করব, নিরীহ মানুষের ওপর ছুরি চালাব, পরমাণু বোমা ফেলব কারণ এসব আমি করছি লক্ষ্য পূরণের জন্য। ফুঃ...

এখন অমূল্যদার কথা ভাবলে মনে অবজ্ঞা আসে।

কিন্তু যেদিন ওঁর মৃতদেহ পাড়ায় ঢুকল সেদিন সারা পাড়ায় পিন পতন নৈঃশব্দ্য নেমে এল। ওঁর মা পাথরের মূর্তির মতো স্থির। সারা পাড়া নিশ্চুপ। কুকুরগুলোও কী বুঝে কে জানে মড়ার মতো পড়ে রয়েছে।

অমূল্যদার বুকের ওপর কে একটা গীতা রেখে গেলেন। কেন রাখলেন? ও তো ওসব মানত না।

সারারাত সারাপাড়া খেল না, ঘুমল না।

পরদিন আবার কেউ পোস্টার, কেউ পাইপগান, কেউ তরোয়াল নিয়ে নামল শহরে। কলকাতায় অন্দরে ফিসফিস করতে লাগল পিকিং।

একটা একটা করে তারিখ বদলাতে লাগল আর বারুদে, লাঠিতে, লকআপে, ছুরিতে ঝলসে উঠতে লাগল কলকাতা। *(চলবে)*

ঐতিহ্য @ কলকাতা

ন্যাশনাল লাইব্রেরি

শ্যামলী গঙ্গোপাধ্যায়

বহু পুরনো শহর আমাদের কলকাতা। তার প্রতিটি পুরনো বাড়ির শেওলা জমা ইটগুলো আসলে ধুলো-ধুসরিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা। তবু সিটি অব জয়ের মধ্যে খুঁজে দেখা অন্য কলকাতা শহরটাকে। আর সেই শহরের নানান ইতিহাসকে। কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার খুব কাছাকাছি বেলভেডিয়ার এস্টেটে অবস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি যে ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার, এটা হয়তো অনেকেরই অজানা থাকতে পারে। এত বড় গ্রন্থাগার আমাদের শহরে, অথচ আমরা অনেকেই এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস সঠিকভাবে জানি না। সত্যি বলতে কী যে কোনও পড়ুয়ার কাছে এটি একটি পীঠস্থান। বেলভেডিয়ার এস্টেটের ত্রিশ একর জমির উপর সাদা বাড়িটার দিকে তাকালে চোখ টানবেই। এমনই তার রাজকীয় মহিমা। ১৭৮০-১৮৫৪ পর্যন্ত এই বাড়িটা ছিল বাংলার গভর্নর জেনারেলের সরকারি বাসভবন।

কলকাতায় সর্বপ্রথম দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' স্থাপন করেন। এখানে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা বিনামূল্যে পড়াশোনার জন্য সাহায্য নিতে আসত। এই লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৬ সালে। এখানকার যিনি প্রথম লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তাঁর নাম জন ম্যাকফারলেন। লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন ১৮৯১ সালে। তিনি চালু করেন ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি। লন্ডন থেকে তিনি এইজন্য প্রচুর বই আনিয়েছিলেন। এরপর দেশের স্বাধীনতা আসার পর এসপ্ল্যানেড থেকে ১৯৪৮ সালে বর্তমান বেলভেডিয়ার এস্টেটে লাইব্রেরিটি স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৫৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উদ্বোধন করেন। নাম দিলেন 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' বা 'জাতীয় গ্রন্থাগার'। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক বা লাইব্রেরিয়ান ছিলেন বি এস দেশভাম। জাতীয় গ্রন্থাগার খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। গ্রন্থাগারে দু'লক্ষ দুশো সত্তর হাজার বই আছে। এছাড়া ছিয়াশি হাজার ম্যাপ এবং তিন হাজার দুশো ম্যানস্ক্রিপ্ট আছে। এই গ্রন্থাগারে একসাথে পাঁচশো পঞ্চাশ জন লোক বসে পড়াশোনা করতে পারেন, যা কিনা অবিশ্বাসের মতো মনে হয়। যে সমস্ত সেলফ বা তাকে বই আছে, তাকে কিলোমিটারে হিসাব করলে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হবে। বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ, গুজরাটি, মরাঠি, পঞ্জাবি, পালির সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় বই রয়েছে এখানে। এখানে প্রতিদিন অজস্র ছেলেমেয়ে এবং স্কলাররা আসেন বইয়ের জন্য। অনেক ঐতিহাসিক এবং লেখকও এই গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিয়ে থাকেন তাঁদের লেখার জন্য।

এই গ্রন্থাগার নিয়ে নানারকম গল্পও প্রচলিত আছে এবং এগুলো সবই প্রেতাত্মাদের। যদিও কেউ কখনও কিছুই দেখেনি। গভর্নর জেনারেল লর্ড মেটাকাফের স্ত্রী নাকি এখানে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ান। কেউ কেউ নাকি তার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাসের শব্দও শুনেছে।

অন্য একটা গল্প আছে, যেখানে বলা হয় কিছু জায়গায় রেনোভেট করার সময় একজন শ্রমিক ভূত দেখে মারা গেছে। আরও একটা গল্প প্রচলিত আছে, একজন রিসার্চ স্টুডেন্ট লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল পড়াশোনার জন্য কিন্তু আর বাড়ি ফেরেনি। সাধারণ মানুষ দাবি করে তারা ছায়া দেখেছে। ২০১০ সালে ভবনের মধ্যে একটি চেম্বার আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেই চেম্বারের ভিতরে কিছু ছিল কিনা তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়নি।

প্রত্যেক ঐতিহাসিক বাড়ির সাথে কিছু গল্প ও রহস্য জুড়ে থাকে। সাধারণত এগুলোই সাধারণ মানুষের অনুসন্ধিৎসা বাড়ায়। এই বাড়ির পরিবেশ, ইতিহাস জানতে যাই হোক গল্পগুলো বহুল প্রচলিত বলে শোনানো হল।

গ্রন্থাগারটি ঘুরতে ঘুরতে বইগুলোতে ধুলোর আস্তরণ দেখলে মনে হয়, এ ব্যাপারে আরও একটু যত্নবান হওয়া উচিত কর্তৃপক্ষের। তবে প্রতিটা ধুলোর স্তরে লুকিয়ে থাকা ইতিহাসের চালচিত্র অনেক ঐতিহ্য ও বয়ে চলা সময়ের সাক্ষী।

গলির ধাঁধায় ধন্দে গুগল, হেঁটে দেখতে শেখার কলকাতায় এখনও ভরসা চায়ের ঠেক

সুদীপ্ত রায়চৌধুরী

'৬০-'৭০-এর দশকে গণ-আন্দোলনের দিনগুলিতে বামপন্থীরা কলকাতার রাস্তা সুরে মাতিয়ে গেয়ে উঠতেন, 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে এ পথ চেনা।' কলকাতার রাস্তা চেনার জন্য এর চেয়ে কার্যকরী পরামর্শ বোধহয় আর কেউ কখনও দিতে পারবে না। কারণ, প্রযুক্তি প্রতি মুহূর্তে যতই উন্নত হোক না কেন, কিছু কাজের জন্য এখনও ভরসা করতে হয় পুরনো অভ্যাসের উপরেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন কোনও অচেনা জায়গায় যাওয়ার আগে আমাদের প্রথম কাজটাই হয় নিজেদের স্মার্টফোনটিকে ফুল চার্জ করে রাখা। কারণ, রাস্তার হদিশ দেওয়ার জন্য গুগল ম্যাপের উপরে কেউ থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করে না আধুনিক টেক-প্রজন্ম। ক্রমশ যন্ত্রনির্ভর হয়ে ওঠা এই প্রজন্মের জন্মের আগে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, 'পথের হদিস পথই জানে ...।' কবিতার মানে যাই হোক না কেন, রাস্তার হদিশ জানতে হলে যে শুধুই গুগল ম্যাপের ভরসা করলে চলে না, তার প্রমাণ মিলবে উত্তর কলকাতায় এলেই। ঐতিহ্য আর নস্টালজিয়ায় মোড়া কলকাতার এই অংশ আজও কিছুটা নিজস্ব রহস্যে মুড়িয়ে রেখেছে নিজেকে। দক্ষিণের ঝাঁ-চকচকে কেতা উত্তরে নেই। বরং উত্তর আজও নিজের প্রাচীনতা নিয়েই খুশি। এখানকার বেশিরভাগ বাড়ি থেকেই খসে পড়েছে পলেস্তরা। বেরিয়ে এসেছে ইঁট। চওড়া রাস্তার গা থেকে শাখানদী, উপনদীর মতো বহু রাস্তা ঢুকে গেছে উত্তরের অন্তরে।

অলি-গলিতে মোড়া শহরের পাকস্থলি উত্তর কলকাতায় যে কোনও ঠিকানা খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ নয়, তা শহরবাসী বিলক্ষণ জানেন। তাই জটিল উত্তরে ঠিকানা খোঁজার জন্য কী করতেন, সে কথা স্মৃতিচারণ করে শোনাচ্ছিলেন বছর পঁয়ষট্টির তপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি পেশায় ছিলেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টিটিভ। তাই ডাক্তারদের ভিজিট করতে শহরের এমাথা-ওমাথা চষতে হতো তাঁকে। তপনবাবু বলছিলেন, 'উত্তর কলকাতার চেয়ে এ-রাজ্যের জেলাগুলিতে কাজ করা অনেক সহজ ছিল। তা প্রথমে বুঝিনি। আজন্ম কলকাতায় মানুষ। ভেবেছিলাম নিজের শহরে কোনও ঠিকানা খুঁজতেই বিশেষ সমস্যা হবে না। কিন্তু ভুল ভাঙল চাকরির প্রথম ক'দিনের

মধ্যেই। বড় রাস্তা বা চেনা কিছু জায়গায় কোনও ডাক্তারবাবুর চেম্বার খুঁজে পাওয়া তেমন কষ্টসাধ্য না হলেও চেনা এলাকার অচেনা গলি খুঁজে বার করা যে কী ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। তখন মোবাইলের যুগ নয়। মোটরবাইকও ছিল না। রিকশা চড়াটা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য। তাই ভারী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হতো। ঠিকানা খুঁজে পেতে ভরসা ছিল রাস্তার মোড়ের তাসের আড্ডা বা কোনও চায়ের দোকান। কিন্তু তাতেও সব ঠিকানা সহজে মিলত এমনটা নয়। বহুবার এমন হয়েছে, যে জায়গার কথা শুনে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি বাড়ির নম্বর আলাদা।' প্রায় কিছুটা একই সুরে বললেন মহীতোষ সরকার। তিনি সেলসম্যানের কাজ করতেন। তাঁর কথায়, 'আমার জন্ম কলকাতায় নয়। কলকাতাকে আমার প্রথম চেনা বইয়ের পাতায়। বইয়ের পাতায় কতবার যে ঘুরেছি কলকাতার অলি-গলিতে। শ্যামবাজার, বাগবাজার থেকে বউবাজার, হাতিবাগান, কলেজ স্ট্রিট। এটা আমার কাছে ছিল অনিমেষ-মাধবীলতার শহর। এখানে মিশে আছে কত ভালোলাগা, কত ভালোবাসা। তারপর চাকরিসূত্রে যখন কলকাতায় থাকা শুরু করি, তখন বুঝলাম নস্টালজিয়ার পাশাপাশি কলকাতার পথ-চরিত্র বোঝা বেশ জটিল। তাই অফিসের কিছু সিনিয়রের কাছ থেকে এলাকাগুলো সম্পর্কে জানতাম। তবে আসল সাহায্যটা পেতাম সেই এলাকার স্থানীয়দের থেকে।'

আধুনিক প্রজন্মের কাছে এই কলকাতা অবশ্য বাংকে রাখা পুরনো বইয়ের মতোই হলদেটে। তাঁরা এভাবে রাস্তা খুঁজে বার করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। তাঁরা ভরসা করেন টেকনোলজিতে। এমনটাই জানালেন আশুতোষ কলেজের পড়ুয়া শুভ্র সরকার। তিনি বললেন, 'সাউথ কলকাতার থেকে নর্থ অনেকটা জটিল। ঘিঞ্জি। তাই অচেনা কোথাও যেতে হলে আমি গুগল ম্যাপের দ্বারস্থ হই। বাস-ট্রাম-মেট্রো করে সেই এলাকার কাছাকাছি পৌঁছই। বাকিটা পায়ে হেঁটে।' কিছুটা একই মত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্যের। তাঁর কথায়, 'কখনও কোথাও যেতে হলে গুগল ম্যাপ অন করে ট্যাক্সিতে চড়ি। দরকার হলে গুগলে ওই এলাকার ম্যাপটা আগেও দু-একবার দেখে নিই।' কিন্তু সব সময় কি সত্যিই গুগল ম্যাপে সব ঠিকানা পাওয়া যায়? 'নাহ্। মেলে না।' কিছুটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন সরকারি চাকুরে মইনুল ইসলাম। তাহলে কীভাবে চেনেন রাস্তা? মইনুলের কথায়, 'আমি কোনও ঠিকানা পাওয়ার পরেই কাকাকে ফোন করি। কাকার গোটা কলকাতাটাই চষা। তবে তিনি ব্যাংকে চাকরি করতেন তো, তাই যে কোনও পথ নির্দেশই সেই ব্যাংকের কোনও না কোনও ব্রাঞ্চকে কেন্দ্র করে দেন। তাতে অবশ্য অসুবিধা হয় না। খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই।' কিছুটা একই কথা জানালেন কলেজপড়ুয়া লুসাই গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, 'কলকাতার রাস্তা মনে রাখাটা আমার পক্ষে খুব চাপের। তাই গুগল ম্যাপ থাকলেও বাবার কাছ থেকে রাস্তার হদিশটা জেনে নিই। আর কোথাও গিয়ে ঠিকানা খুঁজে না পেলে ভরসা সেই স্থানীয় লোকজন বা সেখানকার দোকানদাররা। তবে সবচেয়ে ভালো চায়ের কোনও দোকান। সেখানে এক কাপ চাও খেয়ে নেওয়া যায়। সঙ্গে দোকানে আড্ডা দেওয়া লোকজনের থেকে ঠিকানাটাও জানা যায়। কয়েকবার তো এমন হয়েছে, কেউ কেউ নিজে এগিয়ে সেই রাস্তা চিনিয়েও দিয়েছেন।' আবার অনেকে দু'দিকেই তাল মিলিয়ে চলেন। যেমন সেক্টর ফাইভে একটি বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত দিশা দীক্ষিত। তাঁর কথায়, 'আমি এই শহরে জন্মেছি। কিন্তু সত্যি বলতে এই শহরগুলোর গলিগুলো আমার কাছে অচেনা। চেনার চেষ্টাও করিনি বেশি। ছোটবেলায় বাবা চেনানোর চেষ্টা করত। কিন্তু খুব ভালো শিখে উঠতে পারিনি। ভেবেছিলাম বড় হয়ে ঘুরে ঘুরে সব চিনে নেব। তারপর চাকরিতে ঢুকলাম। সময় কই হাতে? কবজিতে বাঁধা ঘড়ির কাঁটা দৌড়েই চলেছে একটা ডেডলাইন থেকে আরেকটা ডেডলাইনে। কাজ বেড়েছে, সময় কমেছে। তাই কোথাও যেতে হলে ওই এলাকায় গিয়ে ম্যাপে দেখে নিই। না পেলে স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিই। কেউ না কেউ ঠিকানা দেখিয়েই দেয়। তাই নো চাপ।'

কলকাতার রাস্তা চিনতে গুগল ম্যাপ যে যথেষ্ট নয়, তা এক কথায় মানছেন মধ্যবয়স্কদের একটা বড় অংশ। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বছর চল্লিশের অরুণ সরকারের কথায়, 'মোবাইলে রাস্তা হয়তো চেনা যায়। কিন্তু আসল কলকাতাটাকে চেনা যায় না। প্রতিনিয়ত নিজেকে আপডেট করেও প্রযুক্তি সেই কলকাতাকে করায়ত্ত করতে পারে না। সেই কলকাতা চিনতে হলে আপনাকে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা এভাবেই প্রিয় শহরকে চিনেছি।' তাঁর কথার রেশ ধরেই প্রায় অরুণবাবুর বন্ধু প্রিয়তনু ভৌমিক বললেন, 'কলেজে পড়ার সময় বন্ধুরা মিলে বউবাজারের বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। এটা দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটাকে চোখে দেখা। এই মন্দিরটি আপনি গুগল ম্যাপে পাবেন। কিন্তু মন্দিরটা দেখে কিছুদূরে একটা বহু পুরনো গলির মধ্যের একটা চায়ের দোকানে যে অসাধারণ স্বাদের চা পাওয়া যায়, তা আপনি শত চেষ্টা করেও গুগলে পাবেন না। এভাবেই গলির পর গলি ঘুরে বহু কিছু চিনেছি, জেনেছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই হদিশ জানতেও পারবে না।' কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশক রমাপদ সান্যাল নিজের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'মধ্য কলকাতায় বড় হয়েছি তো, গলিঘুঁজির সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পুরনো পাড়াটা ছিল সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর একটি শাখার প্রশাখা-গলির শেষ মাথায়। কিন্তু একদিন বাবা-মার হাত ধরে সেই ঘেরাটোপ ছেড়ে গিয়ে পড়লাম নতুন পাড়ায়, দক্ষিণ কলকাতায়। কিন্তু তারপরও পুরনো পাড়া আমায় টানত। বার বার ফিরে ফিরে আসতাম। হেঁটে হেঁটে ঘুরতাম চেনা গলিগুলোতে। এখন বাড়িতে বসে নাতি কম্পিউটারে গুগল ম্যাপ খুলে সেই রাস্তাগুলো খুঁজতে চেষ্টা করে। কিছু পায়, কিছু পায় না। তাকে বোঝাতে পারি না, অলিগলি খুঁজে শর্টকাট মারার নেশাটা যে কী মারাত্মক...। অবশ্য এই নেশায় যে না ফেঁসেছে, তাকে বলে বোঝানো বেশ দুষ্কর। এখন কাজের চাপ, সময়ের অভাবে যেতে পারি না। তবুও মাঝে মাঝে নতুন কোনও গলির বাঁক চোখে পড়লে মনটা কেমন আনচান করে ওঠে। ফিরে যেতে চায় মন গলিপথে।'

অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস-এর নতুন নতুন ভার্সনের হাত ধরে আমরা আধুনিক থেকে উত্তর-আধুনিক হচ্ছি। আর প্রযুক্তির জালে জড়িয়ে ভুলতে বসেছি অতীতের স্মৃতি-বিজড়িত রাস্তা, অলি-গলি। কিন্তু ঠিকানা খুঁজে দেওয়ার স্মৃতি এখনও জমা হয়ে আছে ঝুল-কালিমাখা চায়ের দোকানে। নিওন আলোয় হলদে হয়ে যাওয়া রাস্তার মোড়ের তাসের আড্ডায়। এখনও সেখানে ঢুঁ মারলে অনেকগুলি হাসিমুখ আঙুল তুলে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১ মে ২০১৭

শিক্ষাব্যবস্থা

ঝুমা দাস মল্লিক

পলাশির যুদ্ধের প্রায় বছরখানেক আগের ঘটনা। একদিন ডাক এল ইংরেজদের দরবারে। মিরজাফরদের কাছ থেকে গোপন চিঠি এসেছে। কোম্পানির মুন্সি তোজাউদ্দিন তো মুসলমান, তাই তাকে দিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চিঠি পড়ালে যদি খবর ফাঁস হয়ে যায়। সেই ভয়ে ডাক পড়ল সাহেবদের মুসুদ্দি নকু ধরের অধীনস্থ কেরানি নবকৃষ্ণের। তিনি পড়লেন। পরদিন থেকেই ষাট টাকা মাইনের মুনশিগিরির চাকরি পাকা। হেস্টিংস সাহেবের পারসি শিক্ষক নবকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে বাংলা, পারসি, আরবি ও উর্দু ভাষায় পটু। ভাষাজ্ঞান ভাগ্যটাই বদলে দিল। মুনশি নবকৃষ্ণ কালক্রমে হয়ে উঠলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। সে-যুগের চাকরিকামী বাঙালির ইংরেজি জ্ঞান নামমাত্র হলেই চলত।

১৬৯০ সালে জন্মানোর পর কলকাতা তখন বড় হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৭৫০ সালের কলকাতায় জনসংখ্যা মোটামুটি ১,২০,০০০। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ ওতপ্রোত জড়িত। কেমন ছিল সেই কিশোর কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থা? এই সময়টাতে যুদ্ধবিগ্রহ আর বাণিজ্যের মাধ্যমে ইংরেজ পায়ের নীচের জমি শক্ত করছে। তাই তখনও পর্যন্ত দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কেমন ছিল সেই ব্যবস্থা? টোল-চতুষ্পাঠী আর মাদ্রাসা ধারাভুক্ত সংস্কৃত আরবি-ফারসি শিক্ষাধারা ছিল উচ্চশ্রেণির জন্য এবং পাঠশালা ও মক্তবের মুখের ভাষায় লেখাপড়া আর শুভঙ্করীর অঙ্ক কষার ধারাটি ছিল অতি সাধারণ জনজীবনের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি। এর মধ্যে প্রথম ধারাটির ব্যয়ভার বহন করতেন উচ্চবর্ণের লোকজন। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ধারাটির খরচ-খরচার জন্য ছাত্রের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন শিক্ষক। ছাত্রদের দেওয়া অর্থেই পাঠশালা-শিক্ষকের দিন চলত। তাই পাঠশালার ছাত্রবৃদ্ধির তাগিদ থাকতই শিক্ষকের কাছে। পাঠশালায় দেওয়া হতো নানা বৃত্তি বা পেশা-শিক্ষা। ঘর তৈরি, পুকুর ও কুয়ো কাটার মাপজোক, নৌকা কালি, দেওয়াল কালি, লেখার কালি তৈরি, পুঁথি নকল করা ইত্যাদি ছিল সেই শিক্ষার অন্তর্গত। তবে বাংলা ভাষা শিক্ষার বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল এই পাঠশালার যুগেই। সেন আমলের তুঙ্গে ওঠা সংস্কৃতচর্চা কমে আসে সুলতানি যুগে। মুসলিম শাসকরা ধর্মনির্ভর মক্তব বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলনের পাশাপাশি পাঠশালা শিক্ষাতেও বাধা দেয়নি। ফলে মাতৃভাষায় ধর্মনিরপেক্ষভাবে দেশজ ভাবধারার সম্মেলনে বৃত্তিশিক্ষাও দিত এই পাঠশালাগুলি। উঁচুশ্রেণির হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উঁচু শ্রেণির জন্য ছিল ফারসি স্কুল। ফারসি ছিল রাজকার্যের ভাষা। তাই উচ্চপদে চাকরিপ্রাপ্তির জন্য ফারসি শিক্ষা ছিল দরকারি। ব্রিটিশরা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলে পরিণত করে।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে প্রথম সচেষ্ট হয় মিশনারিরা। ১৭৮৯ সালে খিদিরপুরে তারা প্রতিষ্ঠা করে সেন্ট থমাস স্কুল; অবশ্য এর সেবামূলক রূপটি ১৭২৬ থেকে ১৭৩১ সালের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। এই স্কুলটি প্রাচীনত্বের দিক থেকে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়।

১৭৭২ সালে হেস্টিংস কলকাতাকে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। ১৬৯৮ সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের থেকে ১৩০০ টাকা ২ পাই মূল্যে কিনে নেওয়া প্রায় ১৭১৮ বিঘার থেকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল তার পরিসর। ব্যবসা এবং রাজকোষ বাড়ছিল। তাই বেশি পরিমাণে কর্মচারী ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসছিল। তাদের দেশীয় আইন-নীতি-নিয়ম-ভাষা শিক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র দরকার। ১৮০০ সালে তৈরি হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তাদের বই দরকার দেশীয় ভাষায়। নিযুক্ত হলেন একগুচ্ছ লেখকগোষ্ঠী— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ। লিখিত এবং অনূদিত হতে লাগল অনেক বই। শ্রীরামপুর ছাপাখানায় বাংলা হরফের নির্মাণ বাংলা শিক্ষাব্যবস্থাকে একধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে দিল।

মিশনারি উদ্যোগের পাশাপাশি ছিল দেশীয় জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা। ১৮১৭ সালে স্থাপিত হিন্দু কলেজ সেই ইচ্ছারই প্রকাশ। আসলে রাজা বদলে গেছে। তাই রাজকার্যের ভাষাও বদলেছে। স্বভাবতই আগে যে কারণে ফারসি পড়ার ঝোঁক ছিল, সেই একই কারণে ইংরেজি শেখার দিকে ঝোঁক বাড়ল। হ্যাঁ, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা হয়তো ছিল একশ্রেণির ছাত্রের উদ্দেশ্য, তবে তারা সংখ্যায় স্বল্প। সরকারি অনুদান দেওয়া শুরু হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে। ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্টে এক লক্ষ টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে খরচের ঘোষণা হল। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত হল মেকলের মিনিট। মেকলে সাহেব, লর্ড অকল্যান্ড— এঁরা সবাই পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার পক্ষেই ছিলেন। রাজা রামমোহন, বেন্টিঙ্ক সাহেবরাও সেই পক্ষেই ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষাদানের প্রসঙ্গে এল চুইয়ে পড়া নীতির ধারণা। সমাজের একটি শিক্ষিত শ্রেণির থেকে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত সমাজে।

একের পর এক স্কুল গড়ে উঠছিল। ১৮২৯ সালে বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত প্রথম স্কুল চিৎপুরের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য। ১৮৩৯ সালে স্কুলটিতে বাংলা মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩০ সালে তৈরি হয় ডাফ সাহেবের দ্য জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন বা পরবর্তীকালের স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল। ১৮৩৬ সালে লা মার্টিনিয়র, ১৮৩২ সালে ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাইস্কুল, ১৮৪৯ সালে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। এই ঘটনাগুলির মাঝে ঘটে যাচ্ছিল আরও নানা সামাজিক উদ্যোগ। রাজা রামমোহন এবং পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান তো অনস্বীকার্য।

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় চার্লস উড সাহেবের ডেসপ্যাচ। সেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের কথা বলা হয়। ভার্নাক্যুলারের প্রসঙ্গেও এই ডেসপ্যাচ মতামত দেয়। ১৮৫০ সাল থেকে কোম্পানির ব্যবসা বিশেষত বস্ত্র-ব্যবসা পালে বাতাস পেল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হল মহারানির ঘোষণাপত্র। দীর্ঘ একশো বছর বাদে কোম্পানির থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। কলকাতা চলছিল তার নিজস্ব ছন্দে। ১৮৪০ সালে লরেটো স্কুল, ১৮৫৬ সালে ক্যালকাটা গার্লস হাইস্কুল, ১৮৬০ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স, ১৮৭৭ সালে ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল ইত্যাদি একের পর এক গড়ে উঠছিল। অবশ্যই তৎকালীন সমাজের পছন্দের মাধ্যম ছিল ইংরেজি। কারণ কেরানি তৈরির লক্ষ্য ছিল সেই শিক্ষার অঙ্গ। দেশজ শিক্ষার বৃত্তিমুখীনতা ভেঙে দিয়ে তৈরি হল চাকরিকামী একটি শ্রেণি।

এরপর ইতিহাসের চলার পথে ঘটেছে নানা ঘটনা। কলকাতাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছে। বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের সময় মানুষ অনুভব করেছেন নিজেদের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। যাদবপুরে গড়ে উঠেছে জাতীয় বিদ্যালয়। তারপর নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এসেছে পরম কাঙ্ক্ষিত ১৯৪৭ সাল। স্বাধীন ভারত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। কলকাতায় গড়ে উঠেছে আরও অনেক ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা মাধ্যম স্কুল। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও নানা সময়ে এগিয়ে এসেছে শিক্ষাবিস্তারের কাজে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার উন্নতিকল্পে গঠিত হয়েছে নানা কমিশন। ১৯৪৮-'৪৯-এ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২-'৫৩-তে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৪-'৬৬-তে কোঠারি কমিশন বা বিভিন্ন শিক্ষানীতিগুলি এই ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম শিক্ষা কমিশন ছিল ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন।

বর্তমানে কলকাতার স্কুলগুলো বিভিন্ন বোর্ডের অধীন। রাজ্য সরকারি WBBSE বা WBCHSE, কেন্দ্রীয় সরকারি CBSE, বেসরকারি ICSE, International School Board- এর নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। সাধারণ শিক্ষায় আজ সহপাঠক্রমিক কাজ এবং সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণ শাখা ছাড়াও বৃত্তিমূলক শাখা, মুক্তবিদ্যালয় ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে। কলকাতায় আজও একের পর এক স্কুল গড়ে উঠছে বেসরকারি উদ্যোগে। কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থা আজ শ্রেণিনিবদ্ধ। আর সেই ধারা জেলাগুলিতেও সঞ্চারিত। অর্থবান উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য রয়েছে ব্যয়সাপেক্ষ বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল। এগুলির অধিকাংশই ইংরেজি মাধ্যম। সেই একই জীবিকার প্রয়োজনেই ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি মানুষের ঝোঁক সমধিক। কারণ ইংরেজি আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও বহুব্যবহৃত ভাষা। শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনীতি, রাজনীতির মতো বিষয়। মানুষের জীবিকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত শিক্ষা। কলকাতা মহানগরী, তাই স্বাভাবিকভাবে এই চাপ এখানে বেশি। সাধ্যের বাইরে গিয়েও আজকের অভিভাবকদের চাহিদা তাই ওই সমস্ত বেসরকারি ব্যয়বহুল স্কুল। অপরপক্ষে সরকারি স্কুলগুলির সিংহভাগ ভুগছে অপুষ্টিতে। অপারগ নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রের ঠাঁই সেখানে।

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

অভিযোগ:

সিইএসসি (উত্তর) ২২৩৭৩১৬১, ২২৩৭৬৪

সিইএসসি (দক্ষিণ) ২৪৬৬৪৬৪৩, ২৪৬৬৩১৬১, ২৪৬৬৩১৬২

বেহালা ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৭৮১৬৭৩

কালীঘাট ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৫৫৫৬০৯

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১ মে ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

চার দেওয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে

অরিজিৎ মৈত্র

ঢং ঢং ঢং। ঘড়িতে সকাল সাতটা। বিপিনবাবু বিছানা ছেড়ে নামতেই স্ত্রী হাতে বাজারের ব্যাগটা ধরিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, ‘যাও বাজার করে নিয়ে এসো।’ চোখ কচলাতে কচলাতে, মধুঘুমের শেষ হাই তুলে বিপিনবাবু বউয়ের কথা শিরোধার্য করলেন। এই রোজনামচায় তিনি অভ্যস্ত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বিপিনবাবুর প্রথম গন্তব্য রামুর চায়ের দোকান। প্রথম রাউন্ড চা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য জল চাপিয়েছে। ‘রামু..’ একটা ডাক শুধু, রামু বুঝে যায় একটা কড়া করে সাদা উইথ টোস্ট বিস্কুট। দোকানে বেশ পুরনো আমলের একটা রেডিও বাজে এই সকালটায়। পাড়ার প্রবীণেরা চা উইথ রাজনীতির আলাপের সঙ্গে একটু-আধটু শোনেন। বিপিনবাবু আজ খুব মন দিয়ে শুনছেন রেডিও, কারণ এই মুহূর্তে বাজছে তাঁর প্রিয় শিল্পীর গান। ‘আকাশ করে ছাদটাকে, বাড়াই যদি হাতটাকে, মুঠোয় ধরি দিনের সূর্য তারার রাতটাকে...।’ রামু বলল, ‘দাদা দেখেছ কেমন সুন্দর গাইছে তোমার শিল্পী।’ এক ধমক দিয়ে রামুকে চুপ করিয়ে মন দিলেন গানে। মান্না দে। সুরে সুরে মনে ভেসে আসছে কত কথা।

ফরাসডাঙার গঙ্গার ঘাট। অ্যান্টনি সাহেব বসে গাইছেন, ‘তব নামে মম প্রেমমুরতি পরাণের গোঠে বাজে।’ এরপর পেরিয়ে গেছে কয়েকটি দশক। মনোহরপুকুর রোড ও অশ্বিনী দত্ত রোডের সংযোগস্থলে স্থানীয় এক ক্লাবের বিজয়া সম্মিলনীর রাতে দরদি শিল্পী আবার গাইলেন ‘মম সরসীতে তব উজল প্রভাত, বিম্বিত যেন লাজে, আমি যামিনী, তুমি শশী হে।’ সেই প্রেমিক কণ্ঠ আজ ইতিহাস, কিন্তু তাঁর অঙ্গীকার আজও শ্রোতাদের কানে বাজে, ‘আবার হবে তো দেখা’। উত্তর কলকাতার রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের ছেলে কৈশোরে স্কটিশচার্চ কলেজ, গোবোর গুহর কুস্তির আখড়া, নকুরের মিষ্টির দোকান, হেদুয়া জলাশয় ছেড়ে, কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গে পাড়ি দিলেন বোম্বে। যৌবনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে ঠিক করলেন, গান-বাজনাই যখন করবেন, তখন আধুনিক বাংলা গান ছাড়াও গাইবেন সর্বভারতীয় গান, মানে হিন্দির সঙ্গে গাইবেন অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার গান। প্রথম প্লে-ব্যাক করেন ‘রামরাজ্য’ ছবিতে। মজার ব্যাপার হল প্রথম বাংলা গানের প্লে-ব্যাক করলেন বোম্বে থেকে। ভি সান্তারামের ‘অমরভূপালী’ ছবির

বাংলা ভার্সান তৈরি করলেন নীতিন বসু। সেই ছবিতেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত এবং বসন্ত দেশাই সুরারোপিত ভূপালী রাগে মান্না দে গাইলেন, ‘ঘনশ্যাম সুন্দর শ্রীধর, অরুণ ওই জ্বালাও, ওঠো ত্বরা করি বনমালী, ওঠো সেজতেজী বনমালী।’ সারেগাপাধাসা নোটেশনের ভূপালী রাগটি গাওয়ার প্রশস্ত সময় রাত্রির প্রথম প্রহর। অদ্ভুত ব্যাপার হল, সারা মহারাষ্ট্রে এই রাগ গাওয়া হয় সকালে।

বোম্বেতে কাকাকে সহযোগিতা করার সময় তিনি হয়ে গেলেন কুমার শচীন দেববর্মনের সহকারী। কিন্তু শিল্পীর মন ভরে না, মনে করেন তিনি কলকাতর ছেলে, বাঙালি। গান করতে চান বাংলা ভাষায়। সুযোগও এসে যায় গীতিকার শ্যামল গুপ্তের কথায়, নিজের সুরে গাইলেন বেশ কিছু গান। শ্রোতারা শুনলেন ‘আমি নিরালায় বসে বেঁধেছি আমার স্মরণবীণ’, ‘আমি আজ আকাশের মতো একেলা’ ইত্যাদি। বাঙালির রোম্যান্টিক মনে তিনি দোলা দিলেন, গাইলেন, ‘ও আমার মন যমুনার অঙ্গে, অঙ্গে’, ‘তুমি নিজের মুখে বললে যেদিন’, ‘যখন কেউ আমাকে পাগল বলে’, ‘ও কেন এতো সুন্দরী হল’, ‘ও চাঁদ সামলে রাখ জোছনাকে’, ‘ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে’ ‘ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বলনা’। শেষের গানটির সুর মান্না দে করেছিলেন কাকা কে সি দের একটি ভজনের সুর থেকে। ভজনটির কথা ছিল ‘শ্যাম ঘুঙ্গটপট জানা’। এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী কৌতুক করে বলেছিলেন, ‘বলতে পারেন এই সুরটি আমি কাকার থেকে চুরিই করেছি।’

বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর গাওয়া অগণিত গানের মধ্যে মনে পড়ে ‘বড় একা লাগে’ (চৌরঙ্গী), ‘আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম’ (শঙ্খবেলা), ‘ও কোকিলা তোরে শুধাইরে’ (বাঘিনী), ‘ঘর ও সংসার সবাই তো চায়’ (সন্ন্যাসী রাজা)। হিন্দি ছবিতে ‘আও ট্যুইস্ট করে’(ভূতবাংলা), ‘পেয়ার হুয়া একরার হুয়া’(শ্রী ৪২০), ‘ধরতি কহে পুকারকে’ (দো বিঘা জমিন) ইত্যাদি গানের জনপ্রিতার কথা কে না জানেন। এছাড়াও শাস্ত্রীয় সংগীতের আঙ্গিকে কিংবা আধুনিক গোত্রের বেশ কিছু কঠিন গানে তিনি ছিলেন সাবলীল। মনে পড়ছে ‘এমন বন্ধু আর কে আছে’ (দীপ জ্বেলে যাই), ‘বাঁচাও কে আছ মরেছি যে’(ছদ্মবেশী), ‘চতুরনাগ’ প্রভৃতি গানের কথা। ‘একদিন রাত্রে’ ছবিতে তিনি গেয়েছিলেন ‘এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়’। গানের লিপ দিতে গিয়ে ছবি বিশ্বাস বলেছিলেন, ‘তুমি এমন বেলেল্লাপনা করে গানটি গেয়েছ, আমি লিপ দেব কীভাবে?’ এরকম অনেক মজার ঘটনাই জড়িয়ে আছে তাঁর গানের সঙ্গে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আজও ধরা আছে শিল্পীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু নেই শুধু তিনি। জীবনের শেষবেলা তাঁর ভালোবাসার শহর থেকে দূর প্রবাসে স্ত্রী সুলোচনার স্মৃতি আঁকড়ে দিন কাটত গৃহবন্দি হয়ে। সেই বন্দিদশা শুধুমাত্র অসুস্থতার জন্য না অন্য কারণে, সেই বিতর্ক আজ থাক। আমরা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। মনে শিল্পীর ছবিও এঁকে রেখেছি। রাখিনি শুধু তাঁর ঠিকানা। আজ গ্রীষ্মের ‘প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিনে’, মান্না দের জন্মদিনে কানে বাজছে তাঁর সেই অঙ্গীকার ‘এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো’।

নবজাগরণের জোড়াসাঁকো

পান্থজন

‘শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে রুক্ষ পথের বুকে এসে নামে দুটো আরবি ঘোড়া। সদর ছাড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে গড়ের মাঠের দিকে। দরোয়ান কাজ ভুলে যায়। প্রতিবেশীরা হতভম্ব। রাজপথের লোকেরা অবাক। এ কী কাণ্ড? চোখের ভুল নয়তো? কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া মেয়ে? তাও মেমসাহেব নয়, বাঙালী। আটসাট পোশাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন কাদম্বরী, ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রী।’ গত শতাব্দীর কোনও এক সময় ঠাকুরবাড়ির দুই সদস্য রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। চিৎপুর রোডের ওপর এমনই দৃশ্য দেখেছিলেন শহরবাসী। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। আজ চিৎপুর রোড সংলগ্ন এই ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বাড়ির ইতিহাস ফিরে দেখব।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই এই বাড়ির মানুষজন আর তাঁদের কর্মকাণ্ড ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ব্যবসা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন ইত্যাদিতে ঠাকুরবাড়ির স্থান ছিল সব সময়ই পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্যদের মৃত্যুর পরে কিন্তু ঠাকুরবাড়ি বেহাত হতে চলেছিল। জওহরলাল নেহরু এবং ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বছরে এই প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেই হস্তান্তর বন্ধ করা হয়। বর্তমানে এই প্রাঙ্গণে রয়েছে তিনটি পুরাতন বাড়ি। একটি মহর্ষিভবন, অন্যটি রবীন্দ্রনাথের তৈরি লালবাড়ি অর্থাৎ বিচিত্রভবন এবং প্রধান ফটকের পাশে অবন-গগন ঠাকুরদের একটি বাড়ি। তাঁদের পিতৃদেব গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মূল বাড়িটি অনেক আগেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, যেখানে ছিল বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা। সেখানে এখন জায়গা করে নিয়েছে রথীন্দ্রমঞ্চ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ বইতে লিখেছেন, ‘জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণ বারান্দার আব-হাওয়া, এ যে কী জিনিস! সেই আব-হাওয়াতেই মানুষ আমরা। এই বাড়ির যেমন দক্ষিণের বারান্দা ওবাড়ির তেমনি দক্ষিণের বারান্দা। পিসিমাদের মুখে শুনতুম ও বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বিকেলে দাদামশায়ের বৈঠক বসত যখন, তখন জুঁই আর বেলফুলের সুগন্ধে সমস্ত বাড়ি, পাড়া তর্ হয়ে যেত।’ সেই বারান্দা আজ তলিয়ে গেছে স্মৃতির অতলে। ঠাকুরবাড়ির প্রধান ফটকটিও প্রায় লুপ্তপ্রায়। এখন অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে দুই ধারে দুটি লোহার স্তম্ভ। রবীন্দ্রপ্রয়াণের দিনে ভিড়ের চাপে মূল প্রবেশদ্বারটি ভেঙে যায়। অনেক কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি মহর্ষিভবনের উদ্দেশ্যে।

দুশো বছরেরও পুরনো বাড়ির ঠাকুরদালান ছাড়াও রয়েছে পারিবারিক সূতিকাগৃহ। মহর্ষিদেব এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজরিত একাধিক ঘর আর আছে রবীন্দ্র প্রয়াণকক্ষ। এর পিছনেও একটি লাগোয়া বাড়ির তিনতলায় এক সময় বাস করতেন কবির প্রিয় নতুনদাদা ও নতুন বউঠান কাদম্বরীদেবী। বাড়ির অন্দরমহলে ঘুরতে ঘুরতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ‘জীবনস্মৃতি’ আর ‘ছেলেবেলায়’ বর্ণিত দৃশ্যাবলি। এই বাড়িরই একটি ছোট টানা বারান্দার মাধ্যমে পৌঁছনো যায় বিচিত্রা ভবনে। লালবাড়ি তৈরি হওয়ার পরে নাকি সবার খেয়াল হয়েছিল যে, বাড়ি নির্মাণের সময় দোতলায় ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়নি। তাই এই সেতুর ব্যবস্থা। বিচিত্রাভবনেরই এক ঘরে ১৯০২ সালে প্রয়াত হয়েছিলেন কবিপত্নী মৃণালিণী। প্রায় ১০০ বছর আগে এই বাড়ির ছাদেই স্টেজ বেঁধে অভিনীত হয় ‘ডাকঘর’। বাড়ির একতলার একটি ঘরে একসময়ে তৈরি হয়েছিল ‘বিচিত্রা ক্লাব’।

দুটি বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বছরের বেশিরভাগ সময়ই অব্যবহৃত অবস্থায় পরে থাকে। শুধুমাত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন এবং বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের মূল অনুষ্ঠানটি হয়। প্রবেশদ্বারের পাশে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত গৃহ, সেখানে রয়েছে উদয়শঙ্কর হল। বরানগর গুপ্তনিবাসে যাবার আগে অবনঠাকুর যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির ঠিকানা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। বাড়ির একধারে আছে স্পাইরাল স্টোয়ারকেস। এখানকারই এক চৌবাচ্চায় একসময় মধ্যাহ্নে অবগাহন স্নান করতেন শিল্পীগুরু। আপাতত এখানে এখন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির দপ্তর খোলা হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ি দেখা শেষ করে এবার বেড়িয়ে আসার পালা। ফিরতি পথে দেখি সরু গলির বাঁদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাস আর ডানদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর মঞ্চ। যখন পুনরায় চিৎপুর রোডের ট্রামলাইনে এসে দাঁড়ালাম তখনও ঘোর কাটেনি। কানে বাজছে কবিকণ্ঠে গান ‘যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়...’। এবার আমার এগোবার পালা উত্তরে। একটু গিয়েই চিৎপুর রোড আর বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল। গত বছরই এখানে ঘটেছিল সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুপুরের ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎই নির্মিয়মাণ উড়ালপুলের একাংশ ভেঙে পড়েছিল। সামনের দিন জানাব রাস্তার ওপারের কথা।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১ মে ২০১৭

যুক্তি-তর্ক-আড্ডা @ কলকাতা

মে দিবস

তন্ময় মণ্ডল

আর পাঁচটা ছুটির দিনের মতো কারও কাছে এটা সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাবার, তো কারওর কাছে একটু অন্যরকম। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যা সচরাচর মে দিবস নামে পরিচিত, প্রতি বছর ১ মে তারিখে উদ্‌যাপিত হয় সারা বিশ্বে। এই দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদ্‌যাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিনটি পালন করে। বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে ১ মে জাতীয় ছুটির দিন। আরও অনেক দেশেই এই দিনটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। কেন এই দিনটিই? কী এর বিশেষত্ব? একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ইতিহাসের পাতায়।

১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে পালিত হয় এই দিনটি। সেদিন দৈনিক আটঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তাদের ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায় ১০-১২জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়।

১৯০৪ সালে আমস্টারডম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করতে সকল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহবান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে সকল শ্রমিক সংগঠন মে'র ১ তারিখে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসাবে পালনের দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকরী হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য মে দিবসকে মুখ্য দিন হিসাবে বেছে নেয়। কোনও কোনও স্থানে শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে আগুনও জ্বালানো হয়ে থাকে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে।

কেমন ছিল তখনকার মে দিবস? এখনও কি সেই শ্রমিক ঐক্য বর্তমান? এখনও কি শ্রমিকরা সেই হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের কথা মনে করে? কতজন ঠিকঠাক জানে এই মে দিবসের ইতিহাস? এসব নিয়ে আলোচনা করতেই এসেছিলাম আগরপাড়ার একটি ডাইং ফ্যাক্টরিতে।

সুকুমার দাস (বর্ষীয়ান কর্মী): মে দিবসের কথা মনে এলে অনেকগুলো কথা বলতে হয়। এই যে আপনি দেখছেন এই ফ্যাক্টরি, এর বয়স তো বড়জোর ৩০ বছর হবে। আমি এ লাইনে প্রায় চল্লিশ বছর হল আছি। এর আগে অনেক ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছি। প্রথম যখন মে দিবস ব্যাপারটা বুঝি তখন আমি যুবক। সদ্য কাজে জয়েন করেছি। শুনলাম ১ মে ছুটি। তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে মঞ্চ করে বক্তৃতা হতো, মিছিল হতো। আর একটা জিনিস ছিল, কৌটোপ্রথা চলত। ব্যাপারটা হল, একটা টিনের কৌটোতে চাঁদা তোলা হতো জনগণের কাছ থেকে। এটা যে সময়ের কথা সালটা কত হবে '৭৪-'৭৫। আমাদের ইউনিয়নের কর্মীদেরও ওইদিন নির্দিষ্ট চাঁদা দিতে হতো। এবার ওই টাকা যে কবে কোথায় কীভাবে কাজে আসতো জানি না! তবু সবাইকেই দিতে হতো। জুলুম করে টাকাও নেওয়া হতো এই ব্যাপারটা আমি বহু বছর দেখেছি। যখন এক স্যারের মুখ থেকে প্রথম এই দিনটার বিশেষত্ব জানি তখন খুব লজ্জা লেগেছিল একজন শ্রমিক হিসাবে। কিছু মানুষের আত্মত্যাগকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার বা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা খুবই লজ্জাজনক। এখন এই কৌটোপ্রথা চোখে পড়ে না ঠিকই তবে দিনটির তাৎপর্য কজন বোঝে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নীলাম্বর দেবনাথ (ডাইং মাস্টার): মে দিবস শ্রমিকদের কাছে সত্যিই একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আমরা যারা এই ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজ করি, ৮ ঘণ্টার ডিউটি যে কতটা চাপের জানি। এর চেয়ে বেশি সময় কাজ করাটা প্রায় অসম্ভব। মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। আমার মনে হয় না এই দিনটি কোনও রাজনৈতিক দলের হতে পারে। এই দিনটি সকল শ্রমিকের লড়াইয়ের স্বাক্ষর বহন করে। একপেশে ভাবে কোনও বিশেষ দিকে একে ফেলে, এতগুলো মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে খর্ব করাটা ঠিক নয়।

রাহুল পাল: আমি বছরখানেক হল কাজে যোগ দিয়েছি। সত্যি বলতে গেলে মে দিবস মানে আমার কাছে আর পাঁচটা ছুটির দিনের চেয়ে আলাদা কিছু মনে হয়নি কখনও। তবে শুনি যে এটা শ্রমিক দিবস ব্যস এইটুকুই।

শ্যামাচরণ পাল: এই ফ্যাক্টরিতে আমি প্রায় শুরুর সময় থেকে আছি। একটা জিনিস দেখেছি যে ১ মে আসলে সবাই ছুটির মেজাজেই থাকে। তবে প্রথম কয়েক বছর এই দিনটাতে আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির হত। বস্ত্রদান হতো। পরের দিকে অবশ্য কেন ছুটি কি বিত্তান্ত সেসব কেউ মাথা ঘামায় বলে দেখিনি।

পুরনো বাড়ি @ কলকাতা

লর্ড ক্যানিং-এর আইডিয়ায় তৈরি হাইকোর্ট

শুভেচ্ছা প্রধান

কলকাতা মানে প্রাসাদনগরী। আর এই প্রাসাদনগরীর নতুন-পুরনো, ছোট-বড় বাড়িগুলোর আড়ালে জমে আছে অতীতের অনেক না-জানা গল্প। ডালহৌসিতে অবস্থিত কলকাতা হাইকোর্ট, যার অন্দরমহলে জমে থাকা ইতিহাসের পাতায় ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নেবো।

সময়টা ১৮৫৯, রানি ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসনভার তুলে নিয়েছেন নিজের দায়িত্বে। কলকাতার পরিবর্তে ভারতের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে রাজধানী স্থাপন করার তোড়জোড় চলছে। রাজধানী সরানো মানে সুপ্রিম কোর্টও সরানো...।

এখানেই লর্ড ক্যানিং-এর মাথায় আইডিয়াটা ক্লিক করল। সুপ্রিম কোর্ট সরানোর আগে কলকাতায় একটা হাইকোর্টের তো খুবই প্রয়োজন! তাহলে তো চোখধাঁধানো একটা হাইকোর্ট বানানো যেতেই পারে! একমাত্র এই পথেই কলকাতাবাসীর কাছে নিজের ভাবমূর্তি ফেরানো সম্ভব!

ঠিক সেই মুহূর্তেই উদ্যোগ নিলেন ক্যানিং। গথিক স্থাপত্যরীতিতে ব্রাসেলস-এর (বেলজিয়াম) ওয়াইপ্রেস টাউন হল-এর মতো গড়েও উঠল এই হাইকোর্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি নিজে এই স্থাপত্যটির ভিত্তি স্থাপন করে যেতে পারেননি। ১৮৬২-র ফেব্রুয়ারিতে স্ত্রী শালটি-র আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হল। এদিকে পরের মাসেই পরবর্তী শাসক লর্ড এলগিন হাইকোর্টের ভিত্তি স্থাপন করলেন, যার স্থপতি ছিলেন ওয়াল্টার গ্র্যানভিল।

ইউরোপীয় ধারণায় সুউচ্চ চূড়াযুক্ত গথিক স্থাপত্য হল শক্তির প্রতীক। ১৮০ ফুট উঁচু টাওয়ার, তিনরকম ডিজাইনওয়ালা তিনটি ফ্লোর, লাল-হলুদ কম্বিনেশনে তৈরি হল কলকাতা হাইকোর্ট। এছাড়া করিন্থিয়ান স্থাপত্যশৈলীর থামগুলিতে গ্রিক উপকথায় বর্ণিত বিচারব্যবস্থায় মোটিফ-এর ধারণা তুলে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন গ্র্যানভিল। তবে তৎকালীন স্থানীয় পরিস্থিতি এই বাড়ির স্থাপত্যকে প্রভাবিত করে ফেলেছিল। বাড়ির কাজ চলাকালীন বিচার বসত টাউন হল-এ। হঠাৎ একদিন সেই সময়কার চিফ জাস্টিস মরিসন হল-এর সিঁড়িপথে ছুরিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তাই জজ ও উচ্চপদস্থদের সুরক্ষার্থে এই বাড়িতে আলাদা একটি যাতায়াতের পথ তৈরি করতে বলা হয় গ্র্যানভিলকে। ইতিমধ্যে শাসক বদলই হয়েছে চারবার! অবশেষে ১৮৭৪-এ লর্ড নর্থব্রুক-এর উদ্বোধন করলেন। হাইকোর্টের বাইরের অবয়ব দেখে মনে হয়, এক বিশাল পাখি যেন ডানা মেলে তার সন্তানদের আগলে রেখেছে। এর অন্দরমহলে রয়েছে ঝরনাসমেত মস্ত বড় উঠোনকে ঘিরে সারি সারি ঘর।

সময়ের স্রোত বইতে থাকে। বাড়ির ভিতরটা সেজে ওঠে বিখ্যাত মানুষের মূর্তি, ছবি ও নানান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রস্তরফলকে। হাইকোর্টের প্রথম চিফ জাস্টিস হয়েছিলেন বার্নিস পিকক। তার চোদ্দো বছর পরে প্রথম ভারতীয় হিসাবে রমেশচন্দ্র মিত্র ওই পদ অলংকৃত করেন।

এদেশীয়রাও এর মহিমায় অভিনব মাত্রা এনে দিয়েছিল।

এক ফুট বাই ছয় ফুট মাপের এক হাইকোর্টেশ্বরনাথ মাধব-এর মন্দির স্থাপিত হল এই চত্বরে। আরও এক চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষী এই হাইকোর্ট। যে ওয়াইপ্রেস টাউন হলের আদলে এই স্থাপত্যটি তৈরি হয়েছিল, সেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুনরায় এই হাইকোর্টের মতো বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষ সেটিকে গড়ে তোলে। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে কলকাতার অনেক বাড়ি ভেঙে পড়লেও হাইকোর্টের অটুট থাকার ঘটনা- এর স্থিতিস্থাপকতার সার্থকতা বজায় রাখে।

'ইওর অনার...' বা 'ইওর লর্ডশিপ...' প্রভৃত সম্বোধন সমেত সওয়াল-জবাবের ঘটনাস্রোত আজও অব্যাহত। হাইকোর্টকে ঘিরে রয়েছে মহাসাগর সমান কাহিনি। কখনও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদেছে, কখনও-বা একটি রায়েই নির্ধারিত হয়েছে মানুষজনের ভবিষ্যৎ। তবে বহু ইতিহাস, বহু ঘটনার সাক্ষী এই হাইকোর্ট এখনও ধরে রেখেছে পুরনো আভিজাত্যের প্রাচীন শেকড়।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১ মে ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

অনুভব করি, কলকাতা আমার সেকেন্ড হোম

নিলয়রঞ্জন বড়ুয়া (ছড়াকার)

কলকাতা আসার প্রথম সুযোগ এল ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি। লিখছি বহুদিন ধরেই। কলকাতার বন্ধুসংখ্যাও নেহাত কম নয়। ডাক এল কলকাতা থেকে। সে ডাক কি উপেক্ষা করা যায়? এমনিতেই ছোটবেলা থেকেই কলকাতার এত গল্প শুনেছি, যে চাক্ষুষ দর্শনের এই সুযোগ কিছুতেই হারাতে চাইছিলাম না।

মূলত ছড়া লিখছি সঙ্গে কবিতাও। দুই বাংলার কাগজগুলোতে ছাপাও হচ্ছে। হঠাৎ বন্ধু তরুণ বিশ্বাসের আমন্ত্রণ এল, 'দুই বাংলার একটা ছড়ালিখন কর্মশালা করছি কলকাতায়। আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে।' তরুণের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় পৌঁছলাম বহুপ্রতীক্ষিত কলকাতায়। একে একে আকাশের বুকে জ্বলে উঠছে এক এক করে সন্ধ্যাপ্রদীপ। স্পষ্ট হয়ে উঠছে গাড়ির আওয়াজ। ক্রমশ কমছে যানজট-কোলাহল। আমাদের ঢাকা শহরটার সাথে কলকাতার একটা অদ্ভুত মিল আছে— রাতে যখন শহরটা শুনশান হয়ে যায় দেখে চেনার উপায় থাকে না শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম রাস্তাটিকেও।

শিয়ালদার কাছে ক্যালকাটা লজে আমার থাকার ব্যাবস্থা হল। সন্ধেবেলা আড্ডা দিতে কলকাতার বেশ কিছু প্রবীণ ছড়াকারও এলেন ক্যালকাটা লজে। পরেরদিন সকাল ১১টা থেকে অনুষ্ঠান কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন মহাবোধি সোসাইটি হলে। যথারীতি তরুণবাবুর সংস্থার ইয়াং মেম্বার কয়েকজন সকাল সকাল চলে এলন ক্যালকাটা লজে। বেশ খানিকক্ষণ জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার পর আমরা রওনা দিলাম। সূর্য সেন স্ট্রিট ধরে এগোতে এগোতে পৌঁছে গেলাম কলেজ স্কোয়ার। ততক্ষণে সারা পশ্চিমবাংলা থেকে লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠান শুরু হল, ক্রমশ ছড়ার আবহে খুব সুন্দর আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। সারা পশ্চিমবাংলা থেকে আসা কবিদের ছড়াপাঠ ছড়া নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। আমি বললাম শিশুতোষ ছড়ার বর্তমান ধ্যানধারণা নিয়ে। সারাদিন অনুষ্ঠান চলল। সন্ধেবেলা আমি, তরুণবাবু আর সুজয় পুরকাইত কফিহাউসে বসলাম আড্ডা দিতে। হৃদয়ের অন্তস্তল ছুঁয়ে যাওয়া মান্না দের গানের সেই কফিহাউসকে আমি চাক্ষুষ দেখলাম। এটাও আমার কাছে খানিকটা স্বপ্নের মতো। তারপর একে একে ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে, রাত্রি নামছে শহরের বুকে। লজে ফিরলাম। পরেরদিন সকালে যাবার কথা হাওড়ায় ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের বাড়ি। যথারীতি তরুণদা সকাল ৯টায় গাড়ি নিয়ে হাজির। আমি, তরুণদা আর সৈকত বলে একটি কমবয়সি ছেলে রওনা দিলাম। রিজার্ভ ব্যাংক সহ বেশ কয়েকটা বড় বড় অফিস কলকাতার এই ডালহৌসি চত্বরে। সেখানে গাড়ি থামল একটু আড্ডা একটু চা-পানের পর বড়বাজার পেরিয়ে গাড়ি ছুটল। অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলাম, যখন হাওড়া ব্রিজ পার হচ্ছি। গঙ্গার জলে সকালের রোদ এক অদ্ভুত আলপনা এঁকেছে।

বিকেলে ফিরলাম ভবানীদার বাড়ি থেকে। ফেরার পথে যখন গঙ্গা পার হচ্ছি, সে সৌন্দর্যও মোহময়। এরপর আরও একটা দিন কেটেছিল কলকাতায়। সকালে মিউজিয়াম, সায়েন্স সিটি, চিড়িয়াখানা দেখলাম। আর বিকেলে রবীন্দ্রসদন চত্বরে আড্ডা মেরে কাটল। সেই দিনগুলো এক অদ্ভুত ভালোলাগার মধ্যে কেটেছিল। আসলে জীবনে কিছু সময় কাটে যা স্মৃতির পাতায় চিরকাল জ্বলজ্বল করে। কলকাতার স্মৃতি আমার কাছে তাই। আবার সময়-সুযোগ হলে কলকাতা যাব। আসলে আমি অনুভব করি কলকাতা আমার সেকেন্ড হোম।

মহাশ্বেতা দেবী

রামবল্লভ দাস

'আমার প্রশ্ন ছিল দ্বিধাহীন/তিরও জবাব দিচ্ছিল নিঃশব্দতা দিয়ে...'

কথায় বলে, Pen is mighter than sword— আর সেই পেনকে হাতিয়ার করেই নিঃশব্দ অক্ষরে অক্ষরে যিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রতিবাদের ভাষা, অবহেলিত সমাজের দিনযাপনের প্রতিচ্ছবি; তিনিই 'হাজার চুরাশির মা', 'দ্রৌপদী'-র রচয়িতা মহাশ্বেতা দেবী।

১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেছেন। এমনকী তাঁর রচনার মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। তাঁর বাবা মণীষ ঘটক ছিলেন কল্লোল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক। মহাশ্বেতা দেবীর মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন লেখক ও সমাজকর্মী।

ছোট্ট মহাশ্বেতা ঢাকার ইডেন স্কুলের মন্টেসরিতে পড়াশোনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরে এসে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। এ-সময় মাত্র দু-বছর শান্তিনিকেতনে কাটলেও তা ছিল তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়। তখনই তাঁর লেখালিখির শুরু। যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন তখন খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তার রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনা 'ছেলেবেলা'। এর বেশ কিছু সময় পরে তিনি সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় ফিচার এবং গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসির রানি' ঝাঁসির রানির (লক্ষ্মীবাই) জীবনী অবলম্বনে রচিত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। আসলে মহাশ্বেতা দেবী আজীবন সংগ্রামী চিন্তা-ভাবনা করেছেন কীভাবে দেশ ও মানুষ সবরকমের শোষণমুক্ত হবে। এবং সেই লক্ষ্যে অফুরন্ত সাহিত্য রচনা করেছেন।

১৯৪৩-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মহাশ্বেতা দেবী তখন প্রথম বর্ষের ছাত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন 'Girls Student Association' -এর হয়ে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে যোগ দিতেন, পার্টির মুখপত্র People's War, জনযুদ্ধ বিক্রি করতেন এবং সে-পত্রিকার নিয়মিত পাঠকও ছিলেন। তবে পার্টির মেম্বার না হয়ে এভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত তখন থেকেই তাঁর কর্মীসত্তার

বিকাশ, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালে মহাশ্বেতা ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে, বিএ পড়তে। ১৯৪৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে এমএ-তে ভর্তি হন। কিন্তু তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পড়াশোনা ব্যাহত হয়।

১৯৪৭ সালে তিনি বিশিষ্ট নাট্যকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের সংসার-জীবন ছিল দারিদ্র্য-পরিবেষ্টিত। এ-সময়ে মহাশ্বেতা দেবী ছাত্র পড়ানো থেকে শুরু করে রং-সাবান, রঙের গুঁড়ো অবধি ফেরি করেন সংসার চালাবার জন্য। ১৯৪৮ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। এরপর একসময় বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘ পনেরো বছরের সংসার-জীবনে ছেদ পড়ে। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে সংসার ভেঙে গেলেও ছেলের জন্য খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সে-সময় তিনি অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন, চিকিৎসকদের চেষ্টায় বেঁচে যান। 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে তিনি ছেলে থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন বলে জানান। এরপর তিনি অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে, কিন্তু সেই সংসারও ১৯৭৬ সালে ভেঙে যায়। নিঃসঙ্গ জীবন, বিচ্ছেদ-বিরহ-বেদনায় তিনি নিজেকে সঁপে দেন লেখা এবং শিক্ষার ব্রতে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী নিজেই পরবর্তীকালে বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে বলেন, 'Bijan has shaped my talent and given it permanent form. He has made me into what I am today.'

তিনি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি', 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার', 'র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার' সহ বহু সাহিত্য পুরস্কার এবং ভারতের চতুর্থ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ লাভ করেন।